উর্বশী অনন্ত ....দিনান্ত

আমরা যারা চাকরীর সুবাদে প্রবাসে আসি তাদের অনেকেই বেশীর ভাগ সময়ই একটা ঘোরের মধ্যে থাকি, কাজ শেষ হলেই দেশে ফিরে যাবো ‘আর মাত্র কটা বছর’ এই ঘোরে। সেই কবছর যে দিনে দিনে কতো কবছরে গড়িয়ে যায় বেশীর ভাগ সময়ই তার হিসেব হয় পেনশনের কাছাকাছি চলে এলে। কিন্তু সেইযে ঘোর লেগে থাকে মনে, মনের সেই ঘোর অনেক দিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ মাত্র কটা বছরে নিজের আশপাশটা কতো ভালো করে ঘুরে নিতে পারি, প্রবাস জীবনের বিভিন্ন আনন্দময়দিকগুলো কতো অল্প সময়ে কতো বেশী উপভোগ করে নিতে পারি, সে তাড়না এই ঘোর থেকেই আসে। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই, যেই না সূর্য্যি মামা পুব আকাশে উকি দিতে শুরু করেন এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে, আমরা বেশীর ভাগ প্রবাসীরা তখন থেকেই তৈরী হই, লং উইকএন্ডগুলো কোথায় কোথায় কাটানো যায় সেই পরিকল্পনা নিয়ে। জনাব যীশু খ্রীষ্টের কল্যানে ইউরোপে মে মাসে সবচেয়ে বেশী সরকারী ছুটি থাকে ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। এর সাথে সাদা কালো প্রচন্ড শীতের প্রকোপ শেষে নানা রঙ্গের ফুলের মনোরম সমারোহ আর আরামদায়ক আবহাওয়া তখন মনকে কিছুটা ঘর পালানোও করে তোলে। সারা মাস ক্লান্ত হই একঘেয়ে সুরের অফিস, স্কুল, গ্রোসারীর নিয়ম চালাতে চালাতে। ছুটির হাওয়া অনেক সময় মনকে স্বস্তির নিঃশ্বাসও এনে দেয়, কিন্তু বাস্তবে বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় ঘটে উলটোটা। সারা মাসে যতোটা না ক্লান্ত হই, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্লান্ত হই ছুটি কাটাতে গিয়ে। ম্যাপ হাতে করে এক স্পট থেকে অন্য স্পটে ছুটে বেড়ানো, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্ত জিনিসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়ার দুর্বার আকাংখা, সব মিলিয়ে সাধারণ কর্ম ব্যস্ত দিনের চেয়েও আরো বেশী সময় পার হয়ে যায় ছুটিতে। অনেক সময় এ সমস্ত কারণ স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে অনেক খুনসুটির উপাদান যোগায়। সবার হয়ত তিন / চার দিনের মধ্যে কোন একটি জায়গার আগা-পাশতলা ঘুরে দেখার আকাংখা এতো তীব্র নয়, ছুটিতে বেড়িয়েছে বলে খেয়ে ঘুমিয়ে আয়েশী-আলসী সময় কাটাতে চায়। যাই হোক এসব টক-ঝাল-মিষ্টি ব্যাপার মাথায় রেখেই আমরা কয়েকটি পরিবার পরিকল্পনা করলাম এবারের মে মাসের চার দিনের ছুটিতে আমরা ‘দিনান্ত’ বেড়াতে যাবো।

বেলজিয়াম আর ফ্রান্স বর্ডারের কাছে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট শহর ‘দিনান্ত’। নামুর শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিনে মাস নদীর তীরে দাড়িয়ে আছে ঝকঝকে দিনান্ত। অনেকেই একে রোমান্টিক শহর বলে অভিহিত করেন। প্রায় ৯৯,৮০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই শহর যার জনসংখ্যা প্রায় ১৩০১২। লোকসংখ্যা আর আয়তন খুব বেশী না হলেও পর্যটকদের জন্য বেশ বিখ্যাত জায়গা দিনান্ত। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য এই রুপসী মেয়ের নাম আছে চারধারে। প্রকৃতি প্রেমী প্রচুর ইউরোপীয়ান এবং নন ইউরোপীয়ান লোকজনও এর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দিনান্তে ভীড় জমান এছাড়া যারা উইন্টার স্পোর্টস ভালোবাসেন তারা শীতের সময় সেখানে ভীড় করেন। এক সময়ের রাজকীয় লোকদের আবাসস্থল দিনান্ত জুড়ে আছে ছোট বড় নানা আকারের ও নকশার মনোরম সব ক্যাসেল। উপমহাদেশের রাজবংশের মতো এখানের রাজবংশীয়রাও নিজেদের আভিজাত্য ধরে রাখতে পারেননি, তাই তাদের অনেকেই ঠিক উপমহাদেশের পুস্কর বা রাজস্থানের রাজবংশীয়দের মতো পূর্ব পুরুষদের বানানো বাড়িতে হোটেল বা জিমার তৈরী করেছেন এবং সেগুলো পর্যটেকদের কাছে ভাড়া দেন, তাদের অনেকেরই এটাই একমাত্র আয়ের উৎস। কোন কোন ক্যাসেল বেশ ভালো অবস্থায় আছে, আর কোন কোনটার ভীষনই জীর্ন শীর্ন দশা। ছোট্ট শহর দিনান্ত অনেক কারণেই পৃথিবী বিখ্যাত। বাদ্যযন্ত্র ‘স্যাক্সোফোন’ এর আবিস্কারক এ্যাডোলফ স্যাক্স ১৮১৪ সালে দিনান্তে জন্মগ্রহন করেন। এছাড়াও বারশ শতাব্দীতে দার্শনিক ডেভিড ওফ দিনান্ত, বিংশ শতাব্দীতে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী জর্জেস

পিয়ারের জন্ম হয় এই শহরে। এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছাড়াও মধ্যযুগে ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী সবচেয়ে নিপুন জিনিস উৎপন্ন হতো দিনান্তে। যার অনেকগুলোতে রুপোর প্রলেপ দেয়া থাকতো। এগুলোকে বলা হতো 'দিনানদেরী'। বিভিন্ন ধরনের মোমদানি, নকশা করা বাড়ি সাজানোর জিনিস পত্র এবং জিনিস পত্র তৈরী করার ছাচ তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল। মাস নদীর উপকূলে তৈরী হতো সে সময়ের সবচেয়ে ফ্যাশনেবাল আসবাবপত্র, যে কালেকশনের নাম ছিল 'মোসান'। একমাত্র অভিজাত শ্রেনী বা রাজ রাজারা ছাড়া সাধারণত সেগুলি কেউ কিনতে পারতেন না। সাতশ শতাব্দী থেকেই ইতিহাসের অনেক জায়গায় দিনান্তের উল্লেখ আছে তবে এর অগ্রযাত্রার বর্ণনার শুরু হয় রোমান সময় থেকে। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ও অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের দ্বারা দিনান্ত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এক ঝকঝকে রৌদ্রজ্জল বৃহস্প্রতিবার সকালে আমরা কয়েকটি পরিবার নেদারল্যান্ডস আর বেলজিয়ামের বিভিন্ন জায়গা থেকে দিনান্তের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিলাম ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে, তার আগে অর্ন্তজাল এর কল্যানে ছবি আর অবস্থান দেখে একটি মোটামুটি সুলভ মূল্যের ক্যাসেলে আমাদের সবার থাকার ব্যবস্থা করলেন দলের অন্য সঙ্গীরা। আমাদের দলবল বড় হওয়াতে বেশ বড় একটা ক্যাসেলের বুকিং দিতে হলো, Anthee গ্রামের Chateau d'Anthee আমাদের ঠিকানা হলো। Chateau আমাদের সবারই বেশ পছন্দ হলো, বিরাট বিরাট সব ঘর, বেশীর ভাগ ঘরেই প্রমান সাইজের আয়না বসানো, সারা বাড়িতেই দেয়ালের পাশ থেকে ছাদ পর্যন্ত উঠে যাওয়া পেল্লায় সব কাঠের কারুকাজ, বিরাট ডাইনীং, হল, বড় বড় সব এ্যান্টিক ডিজাইনের ফায়ার প্লেস, কাঠের ঘোরানো রাজকীয় কায়দার বিরাট সিড়ি, ঠিক যেনো ছবিতে দেখা সব। এই বাড়িতে আমরা চারদিন সবাই থাকতে পাবো ভেবেই বর্তে গেলাম। 'এন্ডহোভেন' দক্ষিন পশ্চিম নেদারল্যান্ডস থেকে মোটামুটি আড়াই ঘন্টার আনুমানিক ড্রাইভিং সময় Route Planner দেখালেও আমরা একটু এদিক সেদিক হারিয়ে প্রায় তিন ঘন্টায় যাত্রাস্থলে যেয়ে পৌছলাম। জিপিএস শুধু প্রথম সেটিং থেকে শেষ সেটিং পর্যন্ত জানে। কিন্তু ইউরোপীয়ান সরকারদের কল্যানে প্রায়ই দেখা যায় নির্ধারিত প্রধান সড়কে কাজ চলছে, মাঝে গ্রামের ভিতর দিয়ে আপাততঃ যাওয়া আসা করার জন্য একটা এন রোড তৈরী করে দেয়া হয়েছে, যেগুলোর হদিস জিপিএস মহাশয় বেশীর ভাগ সময়ই জানেন না, সুতরাং হারিয়ে যাও আর ম্যাপ ধরে খুজতে থাকো কোথায় আছো। তবে বলি হারি যেতে হয় আমাদের ইউরোপীয়ান সরকারদেরকেও, ভালো ভালো রাস্তাগুলো খুড়ে খুড়ে কার্পেটিং করার বহর দেখলে আমাদের ঢাকা শহরের রাস্তা নিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করে। রাস্তা কতো প্রকার ও কাহাকে বলে, প্রত্যেক প্রকার উদাহরন সহ শিখে আসবে। ইউরোপের প্রধান সড়ক গুলোতে অতি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে হয়, হারিয়ে যাও আর যাই হোক কোথাও থামার উপায়তো আর নেই, গাড়ি ড্রাইভ করে একজন আর ম্যাপ রীড আউট করে অন্যজন, দেখা যায় ম্যাপে এক রাস্তা খুজে বের করতে করতে গাড়ি অন্য রাস্তায় ছুটছে তখন। ড্রাইভার আর ম্যাপ রীডারের মাঝখানে তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার উপক্রম বাধে এই নিয়ে। আমরা পৌছার পর সবাই আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠল কারণ দুপুরের লাঞ্চের একটা আইটেম আমার নিয়ে আসার কথা সাথে বাচ্চাদের জুস, চিপস প্রভৃতি। যাহোক পরিকল্পিত সময়ের কিছুক্ষন পর থেকেই আমাদের ছুটির কার্যক্রম আরম্ভ হলো। প্রথমে সবাই আমরা আমাদের সাথে নিয়ে আসা রান্না করা ও অন্যান্য সব খাবার দাবার কুলিং এ রাখলাম। তারপর সবাই মিলে লাঞ্চ খেতে বসলাম, পরটা, তরকারী, মাংস আর মিষ্টি। আমাদের লাঞ্চের গন্ধেই হোক আর যেকারনেই হোক Chateau এর ছোট খাটো সাইজের মালিক তার বউ আর দুই মেয়ে নিয়ে আমাদের দলে ভীড়ে গেলেন, মহানন্দে আমাদের সাথে প্লেট নিয়ে তারা সবাই ডাইনীং এ বসে গেলেন লাঞ্চ খেতে। আমি অবশ্য এতো বড় Chateau এর এতো ছোট সাইজের মালিক দেখে প্রথমে বেশ একটু ভিড়মিই খেয়েছি। সাধারণতঃ ইউরোপীয়ানরা বিশাল আকৃতির হয় তায় ইনিতো আবার রাজবংশীয়। বুঝলাম ইনি ব্যতিক্রম। Chateau এর একপাশে আমরা বাংগালী গ্রুপ আর অন্য পাশটায় ছিলেন এক জার্মান গ্রুপ, তারাও এসে আমাদের লাঞ্চে উকি ঝুকি দিতে লাগলেন, হয়ত ভাবছিলেন আমরা ডিনারটাই কি লাঞ্চে খেয়ে নিচ্ছি নাকি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী, জার্মান আর ডাচে আমাদের মধ্যে বেশ গল্প হতে লাগল, Chateau এর মালিক লাঞ্চ খেয়ে অভিভূত হয়ে আমাদেরকে তার তরফ থেকে নানা ধরনের সহযোগিতার প্রস্তাব দিতে লাগলেন।

লাঞ্চ পর্ব শেষ করে আমরা মোটামুটি সবাই ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে পায়ে হেটে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে বেরোলাম। যে দিকে চোখ যায় শুধু একই দৃশ্য। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের মেলা যেয়ে নীল আকাশকে ছুয়েছে, তার মাঝেই হলুদ সর্ষে ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, কচি কচি ছোট ছোট ভূট্টা লুকিয়ে আছে তার আবরনে। এই দিগন্ত জোড়া মাঠের বুক কেটে মাঝে মাঝেই চলে গেছে ছোট ছোট খাল, ঠান্ডা হাওয়া আর খালের পাড়ের সাদা কাশবন পানির উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয় যে লুকিয়ে থাকলেও আমরা কিন্তু আছি। আমাদের পাশ কেটে মাঝেই মাঝেই সুরুৎ সুরুৎ করে চলে যাচ্ছিলেন স্বাস্থ্য সচেতন ও খেলাধূলা প্রিয় লোকজনেরা। মাথায় হেলমেট পড়ে তাদের মাউন্টেন বাইক হাকিয়ে এক ঢালু থেকে নেমে অন্য ঢালুতে চলে যাচ্ছিলেন। হাটতে হাটতে বেশ এগিয়ে গিয়ে দেখলাম কয়েক জায়গায় বড়ো বড়ো সাইনবোর্ড দেয়া আছে, যারা রোয়িং / বোটিং করতে চান এখানে তাদের জন্য বোট ভাড়া পাওয়া যায়। পাশের খালে দেখলাম একজন দুজনের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর নৌকা, চার বেঠা কিংবা দু বৈঠার, বেশ উৎসাহে লোকজন ভেসে যাচ্ছে। আমরাও কয়েক জন বেশ উৎসাহিত হলাম বোটিং এর জন্য, কিন্তু আমাকে আবার বিফল মনোরথ হয়ে নৌকা থেকে নেমে আস্তে হলো, যে পরিমান শক্তি দরকার দুই হাতে দুই বেঠা ঘোরানোর, তা আমার নেই, দুই হাতে দুটোতো দূরের কথা, আমি দুইহাতে এক বৈঠাও নাড়াতে পারছিলাম না। সুতরাং দাড়িয়ে দাড়িয়ে পা ব্যাথা করে অন্যদের আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যদিও বোটিং এর জন্য সবচেয়ে উৎসাহী ছিলাম এই আমি। বোটিং শেষ করে আমরা আস্তে আস্তে আবার Chateau এর দিকে হাটতে লাগলাম। ফিরে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল খেলাধূলা আর আড্ডা নিয়ে। একপাশে ব্যাডমিন্টন নিয়ে একদল, অন্যপাশে চলল ক্রিকেট। এরমধ্যে বাচ্চাদের প্রাণোচ্ছল কল-কাকলীতো আছেই। চা খেতে খেতে আড্ডাতো অবিরাম চলছেই। এখানে নর্থপোলের কাছে মে মাস থেকেই সন্ধ্যা হয় রাত দশটায়। এরপর রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে শুরু হলো দ্বিতীয় দফা হই-চই। Chateau এর মালিক তার পরিবার নিয়ে আমাদের সাথে ডিনারও সারলেন। তারপরও তারা আমাদের আসরে ছিলেন কিন্তু কখন যে এক ফাকে উঠে গিয়ে তারা তাদের ক্যামেরা আর ভিডিও নিয়ে এসেছেন তা বুঝতেই পারিনি। সারাক্ষন আমাদের হৈ চৈ তিনি ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পালা করে ভিডিও করতে লাগলেন। সবচেয়ে ভালো লাগল যখন তারাও আমাদের সাথে নাচতে উঠে আসলেন। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে নাচতে হয়। আমরা তাদেরকে ভাংরা নাচ শেখাতে লাগলাম। রাত দুটোয়, পাহাড়ের উপড়ের জঙ্গলে একটি পুরনো রাজবাড়িতে, ত্রিশ জন বাঙ্গালীর সাথে কয়েকজন বেলজিয়ান দালির মেহেন্দীর গানের সাথে ‘বোলো তারা তারা’ নাচছে, পুরো দৃশ্যটাই চোখের সামনে ঘটলেও অতি প্রাকৃতিক লাগছিল। আমাদের ভালো লাগছিল তাদের আনন্দ দেখে। গান, কবিতা, জোকস, নাচানাচি হৈ-চৈ এ কখন রাত বারটা রাত চারটায় পৌছে গেছে কেউ টেরই পাইনি। পরদিন সকালে সবার ‘সিটাডেল’ দেখতে যাবার প্রোগ্রাম, সকাল নয়টায় ব্রেকফাষ্ট টেবিলে দেখা হবার কথা ঠিক করে সবাই ঘুমোতে গেলাম।

সকাল নয়টায় সবার ব্রেকফাষ্ট টেবিলে আসার কথা থাকলেও, অনেকেই এসে পৌছতে পারেননি। ছুটির আমেজ আর ঘুমের আমেজ কাটিয়ে নাস্তা সেরে আমাদের সবার বেরোতে বেরোতে প্রায় বেলা এগারটা বেজে গেলো। সাড়ে এগারোটার দিকে আমরা ‘সিটডেলে’ যেয়ে পৌছলাম সবাই। মাটি থেকে প্রায় ১০০ ফুট উপরে বানানো এই রাজবাড়ি। চর্তুদিক দুর্গবেষ্টিত এই রাজবাড়ি এগার’শ শতাব্দীতে প্রথম বানানো হয় ডাচদের দ্বারা, মাস ভ্যালিকে নিজেদের আয়ত্বে রাখার জন্য, পাহারা দেয়ার জন্য তৈরী করা হয় এ বাড়ি। পনরশ ত্রিশ সালে লিঘের প্রিন্স এটিকে আরো সম্প্রসারন করেন। সতেরশ তিন সালে ফরাসীরা এটিকে ধ্বংস করে। এখন এটিযে চারশ বিশ সিড়ি বিশিষ্ট তার কারণ ডাচেরা এটিকে আবার মজবুত করে তৈরী করেন আঠারশ একুশ সালে। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আবারও এর অংশ বিশেষ ধ্বংস করা হয়েছিল। ‘সিটাডেলে’ যাওয়ার দুটি উপায়, এক, কেবল কারের মাধ্যমে অন্যটি চারশ বিশটি সিড়ি চড়া। আমরা বেশীর ভাগই সিড়ি চড়তে মনস্থ করলেও বাচ্চাদের জন্য অনেকেই কেবল কার নিলেন। উপরে যেয়ে আমরা সবাই আবার একসাথে হয়ে ঘুরে ঘুরে ‘সিটাডেল’ দেখছিলাম। প্রাসাদকে ঘিরে বেশ কয়েক জায়গায় কামান বসানো আছে। প্রাসাদের ভিতরে যুদ্ধ অতিক্রম করে বেচে থাকার সমস্ত চিহ্নই এখনও বর্তমান। দুর্গ ঘেরা প্রাসাদটাতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ছাপ স্পষ্ট। বড় বড় ঘর গুলো ঘুরে দেখার সময় অকারনেই গা ছমছম করে উঠছিল, আজকের এই ফাকা ঘরগুলো একসময় কতো লোকের পদচারনায় হয়তো মুখর ছিল। কতো নর - নারীর

আনন্দ বেদনার কাব্য গাথা রয়েছে এই ঘরগুলোকে ঘিরে। বড় বড় সেলার যেখানে ওয়াইন তৈরী ও রাখা হতো সেটি আজ ফাকা অন্ধকার গুদাম। প্রাসাদের বেশীর ভাগ জায়গায়ই ব্যবহৃত হতো সৈন্যদের থাকার জন্য, অস্ত্রের গুদাম ছিল। কিছু কিছু অস্ত্র আজও সেখানে পুরোন দিনের স্মৃতি নিয়ে দাড়িয়ে আছে। কালো কালো আপাত মলিন স্তম্ভগুলো এক কালের সমস্ত অস্থিরতা ও প্রাচুর্য্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে সবাইকে। রাজাদের অতিকায় শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্না ঘর,

'সিটাডেল'...... দিনান্ত

বিরাট বিরাট হল, লোহার পাল্লা দেয়া ভারী ভারী কাঠের কারুকাজ করা দরজা সবই এক কালের সম্পন্ন ইতিহাসের দাবীদার। কতো সৈন্য সামন্ত, প্রজা - উজিরের পদচারনায় মুখর ছিল এই প্রাসাদ। বিভিন্ন দেয়ালে বিভিন্ন শক্তিশালী পুরুষের ছবি সেই কথাই যেনো বলে চলেছে।

প্রাসাদ ঘুরে দেখা ছাড়াও এখানে একটি অস্ত্রের যাদুঘর আর একটি যুদ্ধের যাদুঘর আছে, সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা হলো। যুদ্ধের যাদুঘরে দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা ভিডিও প্রেজেন্টেশন আছে, সে সময়ের যুদ্ধ আর তার পারিপার্শ্বিকতার উপর। প্রাসাদের বাগান এবং উপর থেকে দিনান্তের আশপাশও দারুন চমৎকার দেখতে। আমরা আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলাম 'ক্যাথেড্রেল ওফ নটরেডাম' দেখতে যা প্রাসাদের ঠিক পাশেই অবস্থিত। এই চার্চটি প্রথমে রোমানীয়ান চার্চের আকারে তৈরী করা হয়েছিল বারশ শতাব্দীতে। বারশ সাতাশ সালে পাহাড়ের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে পড়ে এটি ভেঙ্গে যায় যা পরে মেরামত করে অনেকটা গোথিক আকৃতিতে তৈরী করা হয়। মাস ভ্যালিতে ব্যবহৃত বেশীর ভাগ ধর্মীয় উপাদানই দিনান্তে তৈরী হতো সে সময়। সে সমস্ত নির্দশনের একটি আলাদা গ্যালারী আছে চার্চটিতে। 'সিটাডেল আর ক্যাথেড্রেল' দেখে আমরা মুগ্ধ। অনেকেই বসে সেখানে একমনে প্রার্থনা করছেন, তাদের কেউ কেউ

দর্শনার্থীদের পদচারনায় একটু বিরক্তও বটে। প্রায় অন্ধকার চার্চটিতে চর্তুদিকে জ্বালানো মোমের আলোর আভায় বেশ আলদা একটা আবহাওয়ার তৈরী হয়েছে। সমস্ত ঘুরে দেখতে আমাদের প্রায় বেলা তিনটা বেজে গেলো। ফিরে এসে আমরা কিছুটা দেরীতেই লাঞ্চ সারলাম। ভাত, মাংস, সব্জি, ডাল। লাঞ্চ সারার পর একদল লেগে পড়লেন বারবিকিউর আয়োজনে আর অন্যদল দলেরা ভাগ হয়ে কেউ বসলেন আড্ডায় কেউবা চলে গেলেন খেলতে। বারবিকিউর আগুন জ্বললো ছটার দিকে আর তান্দুরী ডান হয়ে নামতে নামতে সন্ধ্যা সাতটা। শুরু হলো আজকের আমাদের ডিনার পর্ব। অনেক জোরে সাউন্ড সিস্টেমে হিন্দী গান, পাহাড়ের কোলে কাস্তের মতো বাকা সদ্য ফোট কিশোরী চাদ আর সাথে আমরা কজনা। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আজ আমাদের চললো জোছনা আড্ডা। পাহাড়ের উপরে আমরা ক্যাম্প ফায়ার তৈরী করে শাল জড়িয়ে সবাই গোল হয়ে বসে একসাথে গলা ছেড়ে ধরলাম, 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ', অবশ্য গানের কোন আগা মাথা আমাদের শেষ পর্যন্ত ছিল না। 'গ্রাম ছাড়া ওই পথ' থেকে আমাদের গান 'জ্যায় জ্যায় শিব শংকর' হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদিকে। আজকেও আমাদের ল্যান্ডলর্ড তার পরিবারবর্গ সাথে নিয়ে আমাদের সাথে সারাক্ষন ঠায় বসে রইলেন তার হ্যান্ডি হাতে নিয়ে। আমরা মাঝে কিছুক্ষন আন্তাক্ষশরী খেললাম, অতি উৎসাহী কজন দূরে গিয়ে বসলেন ভূতের গল্প শোনার জন্য। যে সে ভূতের গল্প হলে হবে না সত্যিকারের ভূতের গল্প হতে হবে আবার। তারজন্য তারা এই হৈ হট্টগোল থেকে দূরে গিয়ে ভৌতিক পরিবেশও তৈরী করলেন সব অন্ধকার করে দিয়ে। বেচারাদের সত্যিকারের ভূতের গল্প শুনে এই লাভ হলো যে এরপর একা তারা আর এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেললেন। আমরা আবার এই ফাকে একটু পাহাড়িয়া নাচের চেষ্টা করলাম ভূমির গানের সাথে, 'মেনকা মাথায় দিলো ঘোমট'। নাচানাচি শেষ করে আবার আড্ডা, তবে এবারের আড্ডার প্রধান বক্তা ছিলেনা আমদের ল্যান্ডলর্ড। প্রথমে যতো মনে হচ্ছিল বেচারারা সারা বৎসর এই বাড়ি আগলে পড়ে থাকতে হয় কোথাও যেতে পারেন না, এখন দেখছি ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। তিনি অনেকটা এখানে বসে থেকেই বিশ্ব ভ্রমন করে নেন। আমাদের আগের সপ্তাহে একদল আফ্রিকান এসে পিকনিক করে গেছে আবার আমাদের পরের সপ্তাহে বুকিং আছে একটা এ্যারাবিয়ান গ্রুপের। গল্পে গল্পে জানতে পারলাম আমাদের পাশে যে জার্মানরা আছেন তারা কালকে চলে যাবেন, কালকে থেকে পুরো প্রাসাদ আমাদের। আবারো রাত চারটার দিকে আমরা সবাই ঘুমাতে গেলাম।

পরদিন সকালে দশটার দিকে সবার নাস্তার টেবিলে দেখা হলো। আজকের কোন বাধা নিয়ম নেই। নাস্তা খেয়ে যার যা ইচ্ছা করা যেতে পারে। শুধু লাঞ্চের পর ক্রিকেট ম্যাচ হবে তখন সবাই যেনো উপস্থিত থাকে সেটাই বলা হলো সবাইকে। আমরা লাঞ্চ খেয়ে বেরোলাম কাছেই একটা 'কেভ' আছে সেটা দেখতে। ঘুরে ঘুরে 'কেভ' এর ভিতরে রাখা নানা জন্তু জানোয়ার এর মুর্তি দেখালাম। সুইটজারল্যান্ডের কেভগুলোর সাথে এটার পার্থক্য পেলাম এটুকুযে এরা অনেক রংি-নি বাতি ব্যবহার করে ভিতরের মুর্তিগুলোতে কিছুটা প্রাণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

'কেভ' .... দিনান্ত

কেভ দেখা দ্রুতই শেষ করতে হলো কারণ আমি ঠান্ডা একেবারেই নিতে পারি না, মাটির নীচে ঢুকতে একটা বিশ্রী রকমের অনুভুতি হয়, যেটা আরো অসহ্যকর। তার উপরে এই কেভ এর প্রকৃতি গুলোকে তারা অনেক বেশীই বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন, যেটা ভয়ানক রকমের গা ছমছম অনুভূতি এনে দিচ্ছে। কেভ দেখা শেষ করে গেলাম পাশের ওয়াটার ফল দেখতে। চমৎকার শান্ত ঝরনা চুপচাপ রিনরিনে শব্দে একটানা গান গেয়ে পথিকদের মন ভোলাচ্ছে। ঝরনার পাশে আসতেই মন জুড়িয়ে গেলো। উপরে পরিস্কার নীল আকাশ, পাহাড় ঘেরা চর্তুদিক মাঝে আমরা এই ঝরনার পাশে। সারা পৃথিবী জুড়ে কি অদ্ভুদ নীরবতা, শান্তি। মাঝে মাঝে অকারনে কিছু পাখি ডেকে উঠছে তাছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও। এখানের শান্ত পরিবেশ দেখলে কল্পনা করতে কষ্ট হয় এই একই পৃথিবীর অন্য জায়গায় এতো হানাহানি চলছে, এই মুহূর্তে। লাঞ্চের আগে আগে আমরা Chateau তে ফিরে এলাম। লাঞ্চ খেলাম পুরো মাছে ভাতে বাঙ্গালী আজকে সবাই। লাঞ্চের পর থেকেই শুরু হলো ক্রিকেট খেলার তোড়জোড় আমাদের। দর্শক কম খেলোয়ারই বেশী। ছেলেমেয়েদের সমতার ভিত্তিতে দল গঠন করা হলো, যদিও ঘন্টাখানেক না পেরোতেই অনেকে বিশেষ করে মেয়েরা পিঠটান দিয়ে Chateau এর বারান্দায় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে পড়লেন। খেলাধূলা শেষে বিজয়ী দলকে এক প্যাকেট বেলজিয়ান চকলেট দেয়া হলো। এরপর শুরু হলো বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বড়দের সবার জন্য খেলাধুলা। প্রথমে বাচ্চাদের মিউজিক্যাল চেয়ার, তারপর বাচ্চাদের মিউজিক্যাল পিলো, বাচ্চাদের ছবি আকার প্রতিযোগিতার পুরস্কার কিন্তু পুরস্কার সবার জন্যই এক, এক প্যাকেট বেলজিয়ান বনবন। বাচ্চাদের শেষ করে বড়দের মিউজিক্যাল চেয়ার, মিউজিক্যাল পিলো, বস্তা দৌড়, বস্তা দৌড়ে অবশ্য অনেক কষ্টে মেয়েদের রাজী করিয়ে বস্তায় ভরতে হলো, চোখ বেধে হাড়ি ভাঙ্গা। বড়দেরকেও ছোটদের মতোই এক প্যাকেট করে বেলজিয়ান বনবন দেয়া হলো, পুরস্কারের বেলায় কোন বড় ছোট ভেদাভেদ করা হলো না। পুরস্কার যাই থাকুক দল বেধে ঘন্টার পর ঘন্টার এই হৈচৈই ছিল আমদের সবার প্রধান আকর্ষন। এরপর ডিনার খেয়ে সবার প্রার্থিত রাতের আড্ডা। আজকের আড্ডায় অবশ্য অনেকেরই বেশ মন খারাপ ছিল এইভেবে যে কালকেই আবার সবাইকে ফিরে যেতে হবে যার যার গন্তব্য এ। ছড়িয়ে পড়ব আমরা আবার সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে নেদারল্যান্ডস আর বেলজিয়ামের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রতি বছরই আমরা উইকএন্ড পিকনিকে বেনেলুক্সের কোথাও না কোথাও আসি, হৈ হুল্লোর করি কিন্তু একটার সাথে অন্য পিকনিকটার কোন মিল থাকে না। এবার যারা আসলেন তাদের অনেকেই হয়ত সামনের বছর আর বেনেলুক্সেই নেই। জীবিকার তাগিদে চলে গেছেন সিঙ্গাপুর, দুবাই কিংবা এ্যমেরিকায়। মৃত্যু হয়ত কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। এই একটি বছরে ঘটে যাবে কিছু, প্রিয় অপ্রিয় ঘটনা। এরমধ্যে সুখের ব্যাপারও ঘটে, নতুনরা এসে আমাদের সাথে যোগ দেন, সেটাও আছে। নানারকম গল্প, গান শেষ করে প্রায় পাচটার দিকে সেদিন আমরা ঘুমোতে গেলাম। আজকের আড্ডায় Chateau এর মালিক বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না, কারোই তেমন মুড ছিলোনা আমাদের সব কথা তাকে ডাচে কিংবা ইংলিশে ভাষান্তর করার। তার বউ মেয়েরা রাত একটাতেই আমাদেরকে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেছেন তিনি আরো কিছুক্ষন থেকে তারপর বিদায় নেন।

পরদিন সকাল থেকেই তোড়জোড় ফিরে যাবার। Chateau কে পরিস্কার করে রেখে যেতে হবে। নাস্তা খেয়েই তাই ছেলেরা লেগে পড়লেন পরিস্কারের বিভিন্ন উপকরন নিয়ে যুদ্ধে। মেয়েরা টীমে তালে জিনিসপত্র গোছালাম। আস্তে আস্তে করে সব আবার গুছিয়ে গাড়িতে তোলার পালা। এভাবেই লাঞ্চের সময় হলে সবাই বসে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। লাঞ্চ শেষে সবাই একসাথে বসে সবাইকে ধন্যবাদ দেয়া হলো, এই আনন্দ সময় উপহার দেয়ার জন্য। তারপর প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুরু হলো সবার বাড়ি ফেরার পালা। বিকেল চারটার দিকে একে একে ফিরে চললাম আমরা যার যার নীড়ের দিকে। উর্বশী দিনান্তকে বিদায় সম্ভাষন জানিয়ে যান্ত্রব দানব চলল উল্কার গতিতে - - - - -

তানবীরা তালুকদার
২৯।০৫।০৭